সারস্বত সাধনায় পৌনে দুশো বছর

অতীন্দ্রমোহন গুণ*

ভূমিকা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা স্থির করলেন উচ্চতর পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির জন্যে তিনটি সরকারি কলেজ স্থাপন করবেন। এভাবেই কলকাতা ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বম্বের এলফিনস্টোন কলেজের যাত্রা শুরু হল। কিন্তু অন্য দুটি কলেজ থেকে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভেদ হল, এটি নতুন কলেজ নয় বরং পূর্বতন হিন্দু কলেজেরই নবরূপ। এ-কারণেই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮১৭ থেকেই কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সূচনা এমন ভাবা যেতে পারে। আর তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, কর্মিমণ্ডলী সবাই মিলে কলেজের ১৭৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উপলক্ষে বাঙালি তথা পূর্বভারতীয় মণীষার বিকাশে বিদ্যায়তনটির ভূমিকা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

জোব চার্নকের বাণিজ্যতরী ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট সুতানুটিতে এসে নোঙর ফেলল। বলা যায় তখন থেকেই পূর্বভারতের সামাজিক আর্থনীতিক জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব শুরু হল। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজ বণিক পুরোপুরি শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু তারপরও প্রায় পঞ্চাশ বছরকাল এ-দেশে বিদ্যাচর্চার পুরাতন ধারাই অব্যাহত ছিল। এ-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের শিক্ষালাভের জন্যে ছিল পাঠশালা। আর টোল-চতুষ্পাঠী এবং মক্তব-মাদ্রাসা ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র।

> "পাঠশালার পাঠ্য ছিল সঙ্কীর্ণ ; সামান্য লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব, পাঠ্য বলিতে এইটুকুই ছিল। তাহাতে না ছিল ইতিহাস ভূগোল, না ছিল ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, হাতের কাজ বা ব্যায়াম। ছেলে চার-পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটাইয়া কোনমতে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে, চিঠিটা-পত্রটা লিখিতে, দলিল দস্তাবেজ তৈয়ারি করিতে ও জমিদারী মহাজনী হিসাবটা রাখিতে শিখিলেই তাহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইত। তখনও ছাপা পুস্তকের চল হয় নাই ; সুতরাং পাঠশালায় সেগুলির ব্যবহার ছিল না।"[১]

পাঠশালায় ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়তো এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকেই তারা আসতো।

দেশে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুর জন্যে টোল-চতুষ্পাঠী আর মুসলমানের জন্যে মক্তব-মাদ্রাসা।

> "নবদ্বীপ, মিথিলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র। সে সকল স্থানে বহু টোল ছিল ; দূর দূর দেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া সেখানে লেখাপড়া করিত। পাটনা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরবী ফারসীর চর্চা ছিল, মক্তব মাদ্রাসা ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি পড়িত। সকলেই যে যাজন বা অধ্যাপনা করিবার জন্য পড়িত তাহা নহে। অনেকে জ্ঞানলাভের আগ্রহে বিদ্যাচর্চা করিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেরা ঘরে আখনজী রাখিয়া ফারসী শিখত, কোরাণ পড়িতে শিখিত ; তাহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে চাহিত তাহাদের মক্তব-মাদ্রাসায় গিয়া ভরতি হইতে হইত। সেগুলিও ঠিক ছিল টোলগুলির মত।"[২]

উনিশ শতকের প্রারম্ভে কলকাতার হিন্দু সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁরা নানাভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। এঁরা এমন এক বিদ্যায়তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন যেখানে ইংরজি ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যালয় প্রবর্তনের উদ্যোগে এঁদের উৎসাহ জুগিয়েছেন এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, ডেভিড হেয়ার, জোসেফ ব্যারেটো, ফ্রান্সিস আর্ভিন প্রমুখ কিছু ইংরেজ। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাঠামো প্রণয়ন, গৃহনির্মাণ ও এজন্যে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে সভাপতি ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হল। কমিটি এক লক্ষ তেরো হাজার টাকা সংগ্রহ করলেন। কমিটির কোষাধ্যক্ষ ব্যারেটো সাহেবের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যারেটো অ্যাণ্ড সন্সের শেয়ার-ক্রয়ে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হল। আশা

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৪৯-৫৩ (রাশিবিজ্ঞান)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

স্থ্য হয়েছিল লভ্যাংশ হিসেবে প্রতি বছর যে-টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়েই বিদ্যালয়ের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।[৩]

হিন্দু কলেজ ঃ ১৮১৭-১৮৫৫

হিন্দু কলেজ নাম দিয়ে এবং মাত্র কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে ১৮১৭ সালের ১৬ জুন গরানহাটায় একটা ভাড়াবাড়িতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। ঠিকানা গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি, ৩০৪ চিৎপুর রোড (বর্তমানের ৩০৪ রবীন্দ্র সরণি)। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে বলা হল – এর মুখ্য উদ্দেশ্য 'সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের পুত্রসন্তানদের জন্যে ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাসমূহ এবং ইয়োরোপ-এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান"। হিন্দু কলেজের দুটি অংশ ছিল ঃ নিম্নতর অংশের নাম পাঠশালা বা স্কুল, উচ্চতর অংশের মহাপাঠশালা বা অ্যাকাডেমি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়" উপন্যাস পড়ে বা দূরদর্শনের পর্দায় এর চিত্ররূপ দেখে পাঠক অনুমান করতে পারবেন হিন্দু কলেজে ভর্তির ব্যাপারে নিম্নবর্ণের হিন্দু সন্তানদের কতটা বেগ পেতে হত। মনে হয়, হিন্দুসমাজের কর্তাব্যক্তিরা এর অন্যায় দিকটি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই বিদ্যার্থীকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হতে হবে এমন শর্ত বর্জিত হল। তা হলেও কিন্তু কলেজের দরজা শুধু হিন্দু বালকদের জন্যই খোলা রইল।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যারেটো অ্যাণ্ড সন্স ব্যবসায়ে মন্দার কারণে উঠে গেল। ফলে কলেজ পরিচালন সমিতি চরম অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হলেন। বাধ্য হয়ে তাঁদের সরকারের কাছে হাত পাততে হল। সরকারি অর্থসাহায্যের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল কলেজের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হওয়ার পরে সরকার প্রস্তাব দিলেন গোলদীঘির উত্তরে সংস্কৃত কলেজ সংলগ্ন জমিতেই হিন্দু কলেজের জন্যে পৃথক অট্টালিকা নির্মাণের। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজ নতুন বাড়িতে উঠে এল। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত কিন্তু এটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই রয়ে গেল।

১৮১৭ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষকসংখ্যা উভয়ই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষণের মানেও উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষিত হয়। ইতিমধ্যেই কলকাতা শহরে আরও দুটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে – একটি সরকারি ক্ষেত্রে সংস্কৃত কলেজ, অন্যটি স্কটিশ মিশনারী ডাফ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটুশন (উত্তরকালের স্কটিশ চার্চ কলেজ)। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়, আইনজ্ঞ অনুকূল মুখোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ। খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডি. এল. রিচার্ডসন। বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন রসময় দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, রামচন্দ্র মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও প্যারীচরণ সরকার।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু কলেজ নিয়ে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। পূর্বভারতের মুসলিম সমাজও এ-সময়ে ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন এবং এ-বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে সরকারের দ্বারস্থ হলেন। সরকার দেখলেন, মুসলিম ছাত্রদের জন্যে পৃথক বিদ্যালয় করতে গেলে যথেষ্ট সংখ্যায় ছাত্র না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ; বরং হিন্দু কলেজের নিয়মাবলীতে খানিকটা পরিবর্তন করে নিলেই এ-সমস্যার সহজ সমাধান হয়। সরকারি অর্থসাহায্যের উপরে অত্যধিক নির্ভরতার কারণে হিন্দু কলেজের পরিচালন সমিতিকেও এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হল। ঠিক হল, কলেজের উচ্চতর বিভাগ অর্থাৎ "অ্যাকাডেমি"-কে প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম দিয়ে সেখানে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সেরা ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হবে। (প্রায় একই সময়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সির প্রয়োজন মেটাতে যথাক্রমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বম্বের এলফিনস্টোন কলেজ স্থাপিত হল।) কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অভিপ্রায়ের কথা মনে রেখে এর নিম্নতর বিভাগটিকে হিন্দু স্কুল নাম দেওয়া হল, আর সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রইল। এ-দুটি বিদ্যালয়ই এবারে সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।[৪, ৫]

প্রেসিডেন্সি কলেজ ঃ ১৮৫৫-১৯১৭

প্রেসিডেন্সির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ১৮৫৫ সালের ১৫ জুন। সূচনায় কলেজের তিনটি শাখা ছিল – সাধারণ শাখা, মেডিক্যাল শাখা ও এঞ্জিনিয়ারিং শাখা। কিন্তু অল্পদিন পরেই মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্যে পৃথক কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শাখা বন্ধ করে দেওয়া হল। তবে অন্য একটি শাখা, আইন শাখা, কলেজের সঙ্গে যুক্ত হল। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও প্রেসিডেন্সির গুরুত্ব বজায় থাকল, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তখন পরীক্ষা নেওয়ার ও ডিগ্রী দেওয়ার সংস্থা মাত্র এবং প্রেসিডেন্সিই হল তার অনুমোদিত কলেজগুলির মধ্যে প্রধানতম।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানাভাব সমস্যা প্রবল হয়ে উঠল। সরকার তাই পূর্বতন বাড়ির লাগোয়া অনেকটা জমি কিনে নিয়ে সেখানে কলেজের সকল বিভাগকে স্থান দেওয়ার জন্যে একটি বড়ো অট্টালিকা তৈরি করে দিলেন। ১৮৭৪-এর ৩১ মার্চ বড়লাটের উপস্থিতিতে নতুন ভবনের দ্বারোদঘাটন হল। এই ভবনটিই এখন কলেজের "মেন বিল্ডিং" হিসেবে পরিচিত।

উৎকৃষ্ট শিক্ষকমণ্ডলী, উত্তম পরীক্ষাগার, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, সুবিন্যস্ত ছাত্রাবাস ও পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস, সব মিলিয়ে এ-সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাচর্চার এক আদর্শ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ক্রমে দেশবিদেশে প্রেসিডেন্সির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বলা হল, প্রেসিডেন্সি কলেজ হল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের ছাত্ররা নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বি. এ. অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর স্থানগুলির শতকরা নব্বুইটি এ-কলেজের ছাত্ররা অধিকার করতো। কতৃপক্ষ যখনই নতুন কোনো শাস্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধি করতেন তখনই কলেজে তার পাঠনের ব্যবস্থা হত। বস্তুত সারা দেশের মধ্যে প্রেসিডেন্সিতেই প্রথম এম. এ. স্তরে অর্থনীতি পাঠ্যক্রম চালু হল। বিভিন্ন মানবিক বিদ্যায় অধ্যাপনার ব্যবস্থা তো প্রথম থেকেই ছিল। তাছাড়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরবিদ্যা বা ভূতত্ত্বের মতো বিষয় প্রেসিডেন্সি কলেজ বাদ দিলে পূর্ব ভারতের অন্য কোথাও পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০৩ সালে বাণিজ্য বিষয়ের একটি পাঠ্যক্রমও চালু হয়। (অবশ্য চার বছর পর বাণিজ্যিক পাঠ্যক্রমের জন্যে প্রেসিডেন্সির পরিবর্তে অন্য একটি কলেজ বেছে নেওয়া হয়।) আগে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বি. এ.-র 'বি' কোর্সে পড়ানো হত। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় এর পরিবর্তে বি. এস-সি. কোর্স প্রবর্তন করলেন। প্রেসিডেন্সিতেও সঙ্গে সঙ্গে এ-পরিবর্তন সাধিত হল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর উঁচু পদগুলিতে প্রথম দিকে ব্রিটিশ অধ্যাপকরাই নিযুক্ত হতেন। তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত – যেমন চার্লস টনি, হেনরি রশার জেমস, ডব্লু. সি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এইচ. এ. স্টেপলটন, আর. বি. র‍্যামসবোথাম, আর. এন. গিলক্রিস্ট, ই. এফ. ওটেন, জে. আর. ব্যারো, অ্যালেকজাণ্ডার পেডলার, সি. ই. কালিস। পরে ক্রমশ ভারতীয়দের এই পদগুলিতে নিয়োগ করা হতে থাকে। এঁদের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ ও এইচ. এম. পার্সিভ্যাল ইংরেজির এবং প্রসন্নকুমার রায় ও আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অনুরূপ খ্যাতি লাভ করেন ইতিহাসের কুরুভিলা জ্যাকেরিয়া, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং রসায়নের প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এঁদের পরে আসেন ইংরেজির প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শনের সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অর্থনীতির জাহাঙ্গীর কয়াজি, গণিতের দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, পদার্থবিদ্যার চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূতত্ত্বের মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং শারীরবিদ্যার সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। আমরা এখানে যে-সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে প্রেসিডেন্সি থেকে যাঁরা স্নাতক হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, অক্ষয়কুমার মিত্র, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, চিত্তরঞ্জন দাশ, হরিনাথ দে, বিনয়কুমার সরকার ও যদুনাথ সরকারের, আসামের আনন্দরাম বড়ুয়ার, বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদের এবং হায়দ্রাবাদের সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামির। এঁদের থেকে তরুণতর কিন্তু সমান খ্যাতিমান্‌ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি, হুমায়ুন কবীর, নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।[৬৭]

প্রেসিডেন্সি কলেজ : ১৯১৭-১৯৭০

১৯১৭ সালে কলেজের একশো বছর পূর্ণ হল। কিন্তু ঐ বছরই কলেজটির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতিতে প্রথম ব্যাঘাত ঘটে, কারণ উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন থেকে স্নাতকোত্তর পাঠনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। ফলে প্রেসিডেন্সি মুখ্যত একটি স্নাতকনিম্ন স্তরের কলেজে পরিণত হল। কলেজকে অনুমতি দেওয়া হল এম.এ. ও এম.এস-সির কিছু ছাত্রকে ভর্তি করার ; কিন্তু ব্যবস্থা হল, এই ছাত্রদের পড়ানোর দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয় নেবেন। এদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি নেওয়ার দায়িত্ব অবশ্য কলেজের হাতেই থাকল। নতুন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্সির অধ্যাপকদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ল , যদিও এঁদের অনেকেই অধ্যাপনার উৎকর্ষে ছাত্রছাত্রীদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আংশিক সময়ের সাম্মানিক শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগগুলির সঙ্গে যুক্ত রইলেন।

১৯১৭ সালের পরবর্তী কালেও শিক্ষাগত উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

থাকে। বস্তুত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে প্রেসিডেন্সি সারা দেশের সর্বোত্তম স্নাতকনিম্ন স্তরের কলেজ হিসেবে স্বীকৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নানা প্রতিবেদনে এই স্বীকৃতির পরিচয় মেলে । তবে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে প্রেসিডেন্সির যে একটা সর্বভারতীয় রূপ ছিল, তা পরবর্তী বছরগুলিতে দেশের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে প্রেসিডেন্সি অনেক পরিমাণে বাঙালি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করে ।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে রাশিবিজ্ঞান, ভূগোল ও প্রাণিবিদ্যার মতো নতুন বিষয়ের জন্যে কলেজে পৃথক বিভাগ খোলা হয় । বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আগে সংস্কৃতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল । ১৯৪৫ সালে একটি পৃথক বাংলা বিভাগ স্থাপিত হয় । তেমনি আগে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ একই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বছরে উর্দূর জন্যেও পৃথক বিভাগ খোলা হয় । অবশ্য কয়েক বছর পরেই সংস্কৃত বিভাগটিকে সংস্কৃত কলেজে এবং আরবী ও ফার্সীর বিভাগ এবং উর্দূ বিভাগটিকে সেন্টাল ক্যালকাটা (বর্তমানের মৌলানা আজাদ) কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় ।

চল্লিশের দশকের একটি বড়ো পরিবর্তন কলেজে স্থায়ীভাবে সহশিক্ষার প্রবর্তন । ১৮৯৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ছাত্রীকে কলেজ ভর্তি করা হয় । কিন্তু অল্পদিন পরেই এ-ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় । শুধু কোনো কোনো বছরে স্নাতক পরীক্ষায় কৃতিত্বের নিরিখে কোনো ছাত্রী ঈশান বৃত্তি পেলে তাঁকে কলেজের মাধ্যমে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি করা হত । ১৯৪৪ সালে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ছাত্রছাত্রী উভয়কেই কলেজে যোগ্যতার অভিন্ন মানদণ্ডে ভর্তির জন্যে নির্বাচন করা হবে । এ-সময় থেকেই সম্পূর্ণ মেধার বিচারে ছাত্রছাত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা শুরু হয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী সাধারণ পরীক্ষায়, যেমন আই.এ., আই.এস-সি, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের অথবা যুগ্মভাবে ঐ নম্বর এবং কলেজের নিজস্ব ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করার প্রথা চালু হয় ।

শিক্ষকদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও সু-অধ্যাপনার ঐতিহ্য এই সময়েও অক্ষুণ্ণ ছিল । ইংরেজিতে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারকনাথ সেন ও অমল ভট্টাচার্য এসেছেন । বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন জনার্দন চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, ভূদেব চৌধুরী ও ভবতোষ দত্ত । দর্শন বিভাগে গোপীনাথ ভট্টাচার্য ও প্রবাসজীবন চৌধুরী, ইতিহাসে অমলেশ ত্রিপাঠী ও অশীন দাশগুপ্ত, অর্থনীতিতে যোগীশচন্দ্র সিংহ, ভবতোষ দত্ত ও তাপস মজুমদার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, রমেশচন্দ্র ঘোষ ও নির্মল বসু রায় চৌধুরী, গণিতে বিভূতিভূষণ সেন, সনৎকুমার বসু ও মুরারিমোহন রায়চৌধুরী, রাশিবিজ্ঞানে অনিলকুমার ভট্টাচার্য ও বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পদার্থবিদ্যায় কুলেশচন্দ্র কর, রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ও সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, রসায়নে কুদ্‌রত্-ই-খুদা, নির্মলকুমার সেন, প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, সুধীরচন্দ্র সোম ও প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরমনাথ ভাদুড়ি ও হীরালাল চক্রবর্তী, প্রাণিবিদ্যায় শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যায় নরেন্দ্রমোহন বসু ও সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূবিদ্যায় সন্তোষকুমার রায় ও অজিতকুমার সাহা এবং ভূগোলে নিশীথরঞ্জন কর ও অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় কলেজে সু-অধ্যাপনার ঐতিহ্য উজ্জ্বল রেখেছেন । এঁদের অনেকেই প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্র ; যাঁরা প্রাক্তন ছাত্র নন তাঁদেরও এ-কলেজের সঙ্গে একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল । তাই অনেকে দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাপ্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চপদ ও উচ্চবেতনের চাকরির প্রস্তাব পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ।

এ-সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে-গবেষণার কাজ হয়েছে তাও যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বের বিষয় হতে পারতো । পদার্থবিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র মৌলিক গবেষণা করে গেছেন ; সে ধারাকে পরবর্তীকালে কুলেশচন্দ্র কর, রাজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বিজয়শঙ্কর বসাক, অমলকুমার রায় চৌধুরী ও শ্যামল সেনগুপ্ত বহমান রেখেছেন । তেমনি পেডলার ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়নে গবেষণার যে-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বহন করেছেন সুধীরচন্দ্র সোম, প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মিহির চৌধুরী । শারীরবিদ্যায় সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাশিবিজ্ঞানে অনিলকুমার ভট্টাচা যে-গবেষণা করেছেন তাও দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে । এ-কলেজেরই একটি ঘরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রাশিবিজ্ঞানের চর্চা করেছেন কয়েকজন সহযোগী গবেষককে নিয়ে । এ-গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট স্থাপন করে রাশিবিজ্ঞান চর্চায় দেশকে প্রভূত মর্যাদার অধিকারী করেছেন । বিজ্ঞানের অন্য শাখা থেকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । দর্শনে প্রবাসজীবন চৌধুরী, অর্থনীতিতে তাপস মজুমদার, অমিয় বাগচী ও মিহির রক্ষিত বা ইতিহাসে শশিভূষণ চৌধুরী ও অশীন দাশগুপ্ত যে ধরণের গবেষণা করেছেন তাও এ-কলেজের গর্বের বিষয় ।

এ-সময়েও প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা জীবনের নানা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য অর্থনীতির অমর্ত্য সেন ও সুখময় চক্রবর্তী, রাশিবিজ্ঞানের জয়ন্তকুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্যার অশেষপ্রসাদ মিত্র, বিশ্বরঞ্জন নাগ ও চঞ্চল মজুমদার, ভূবিদ্যার ক্ষিতীন্দ্রমোহন নাহা, ইতিহাসের তপন রায়চৌধুরী, দর্শনে অরিন্দম চক্রবর্তী, ইংরেজির সুকান্ত চৌধুরী, কেতকী কুশারী ডাইসন ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক। দেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্ররা উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছেন, অনেকে শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অধিকর্তার পদে থেকেছেন। নানা সরকারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্ররা কর্ণধার হিসেবে আসীন থেকেছেন। জীবনের অন্যতর ক্ষেত্রেও অনেক প্রাক্তন ছাত্র মর্যাদার আসন অধিকার করেছেন। এঁদের মধ্যে চলচ্চিত্রকার-সাহিত্যিক-শিল্পী সত্যজিৎ রায়, কবি শঙ্খ ঘোষ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়, সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী ও চঞ্চল সরকার, রাজনীতিক-প্রশাসক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও জ্যোতি বসু প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।[৮, ৯]

আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ

প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্প্রতি সমাজতত্ত্বের জন্যে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং হিন্দী বিভাগটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগ ও ভূবিদ্যা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষ সহায়তায় কলেজে দুটি গবেষণা-কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। গত বছর থেকে পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ এম.এস-সি. পাঠ্যক্রম পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এ-পরিবর্তন প্রেসিডেন্সির সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিতে একটি বড়ো পরিবর্তন সূচিত করছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য বিভাগেও সম্পূর্ণ এম.এ. বা এম.এস-সি. পাঠ্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

এটা ঠিক কথা যে অনেকে মনে করছেন আজকের প্রেসিডেন্সি হিন্দু কলেজ বা অতীত দিনের প্রেসিডেন্সির একটি অনুজ্জ্বল প্রতিবিম্ব মাত্র। সারা দেশেই শিক্ষাগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নানা ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপনা-গবেষণায় উৎকর্ষের জন্য নিরলস প্রয়াসের পরিবর্তে আত্মপ্রচার, দাবীদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা, সেমিনার সিম্পোসিয়ামে উপস্থিতি বা রাজনীতিকের আজ্ঞাবহন-এসবের মধ্যেই অনেক অধ্যাপকের সময় কাটে। প্রেসিডেন্সির বেলায় কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ততা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে নানা ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সঙ্কটকে জটিলতর করেছে। আগে প্রেসিডেন্সির সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই এ-কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হতেন। ফলে কলেজের সঙ্গে তাঁদের একটা নিবিড় আত্মিক বন্ধন থাকতো। এর ঐতিহ্য বহনে তাঁদের একটা নৈতিক দায়বদ্ধতা দেখা যেত। এখন কিন্তু সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নতর বেতনহার, অস্পষ্ট বদলী নীতি এসব কারণে সরকারি কলেজের চাকরিতে ঢুকতেই চাইছেন না। আবার অনেক সু-অধ্যাপক নানা বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর বেতনহার, অধিকতর অনুকূল কর্মপরিবেশ ইত্যাদির কথা ভেবে সরকারি কলেজের চাকরি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। এসব কারণে সাম্প্রতিককালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উৎকর্ষ বেশ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল হয়তো এখনো মন্দ নয়। কিন্তু বিতর্ক সভায় আলোচনার মান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মান বা কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধাদির মানে এই অবক্ষয় স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা যে-হারে ক্লাসে, বিশেষ করে পাস বিষয়ের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তার মধ্যেও এই অবক্ষয়ের পরিচয় মেলে। মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত বিভাগগুলিকে বাদ দিলে গবেষণার কাজও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে বলা চলে।

এ-অবস্থা থেকে প্রেসিডেন্সিকে উত্তোলনের কোন সচেতন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। ১৯৭৭ সালে পদার্থবিজ্ঞানী উদগাঁওকরের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক প্রতিনিধিদল কলেজ পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা কলেজের বিভিন্ন বিভাগ ও গ্রন্থাগার-পরীক্ষাগার পরিদর্শন করেন এবং ছাত্র-অধ্যাপক উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশনের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনে তাঁরা ঘোষণা করেন যে প্রেসিডেন্সি সারাদেশে সেরা কয়েকটি কলেজের অন্যতম ; বিশেষত এর স্নাতকনিম্ন পর্যায়ে পঠনপাঠন সারা দেশের কাছে আদর্শস্বরূপ। তাঁরা মঞ্জুরী কমিশনের কাছে সুপারিশ করেছিলেন প্রেসিডেন্সিকে 'অটোনোমাস কলেজ'-এর মর্যাদা দেওয়া হোক। এর অর্থ হবে কলেজে ছাত্র ভর্তির নিয়মকানুন স্থির করা, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, অধ্যাপনাপদ্ধতি প্রণয়ন এবং পরীক্ষাগ্রহণ-এ কাজগুলি সম্পাদনে কলেজের স্বাধীনতা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করবেন, অর্থাৎ লক্ষ্য রাখবেন যে পঠনপাঠন, পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং অভিপ্রেত মানানুসারে সম্পন্ন হচ্ছে। উদগাঁওকর কমিটির পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাদি খুঁটিয়ে দেখার জন্যে মঞ্জুরী কমিশনদ্বারা নিযুক্ত গণি কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভবতোষ দত্ত কমিশনও প্রেসিডেন্সিকে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

অটোনোমাস কলেজ হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্যে সুপারিশ করেছেন। অতি সম্প্রতি অশোক মিত্র কমিশনও একই সুপারিশ করেছেন। দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি।[১০]

এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিন্তু কিছু কিছু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা প্রেসিডেন্সিতে সু-অধ্যাপনার ঐতিহ্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেছেন। নিজেরা বইপত্র লিখছেন, গবেষণা করছেন, গবেষক-ছাত্রদের তত্ত্বাবধান করছেন।

প্রেসিডেন্সির বৈশিষ্ট্য

কলেজের সূচনা থেকেই প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এটা ঠিক কথা। কিন্তু পঠিত বিষয়ে কিছু অসংলগ্ন তথ্য আহরণ করে, কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেও পরীক্ষায় ভালো ফল করা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈশিষ্ট্য, এখানে অধ্যাপনায় বিষয়ের গভীরে যেতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। দার্শনিক হোয়াইটহেড বলেছেন ঃ

"Culture is activity of thought, and receptiveness to beauty and human feeling. Scraps of infomation have nothing to do with it."[১১]

অধ্যাপনায় প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষ তৈরি করার লক্ষ্য সামনে রাখতে হবে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষা হল কোনো বিষয়ে খুঁটিনাটি আয়ত্ত করা—যে-কাজটা মিনিট ধরে ঘন্টা ধরে দিনের পর দিন করে যেতে হয়। কিন্তু তাহলেও উদ্দেশ্য থাকবে সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা। হোয়াইটহেডের ভাষায় ঃ

"The problem of education is to make the pupil see the wood by means of the trees."[১২]

অর্থাৎ কিছু তত্ত্ব ও তথ্য আত্মস্থ করানোই বড়ো কথা নয়। চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করাই হবে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। বিগত পৌনে দুশো বছর ধরে প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষার এই আদর্শকে যথাসম্ভব রূপায়ণের চেষ্টা হয়েছে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

"... the primary reason for their existence is not to be found either in the mere knowledge conveyed to the students or in the mere opportunities for research afforded to the members of the facutly. ..... The justification for a university (or college) is that it preserves the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning".[১৩]

ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ক্লাসরুমের ভেতরে এবং ক্লাসরুমের বাইরে অধীত বিষয়ের নানা দিক নিয়ে আলোচনা প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিমণ্ডল গঠনে সহায়ক হয়েছে। এভাবেই প্রেসিডেন্সি কলেজ দেশে বিদেশে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন মনে করার কারণ নেই যে শুধু পরীক্ষার ফলের মধ্য দিয়েই এখানকার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উৎকর্ষ প্রতিভাত হয়েছে। কলেজের বিতর্কসভা, রবীন্দ্রপরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠান, অন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কলেজ পত্রিকা—সব কিছুর মধ্যেই এ-উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গেছে।

পরীক্ষায় ভালো ফল করা এবং ভালো মাইনের চাকরি জোগাড় করা প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রীদের ধ্যানজ্ঞান ছিল, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কলেজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এখানকার ছাত্রছাত্রীরা একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, আই.সি.এস., আই.এ.এস. ইত্যাদি পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে বড়ো আমলা হয়েছেন, তেমনি অনেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। "ইয়ং বেঙ্গল"-এর সদস্যরা বঙ্গদেশের উনিশ শতকী নবজাগরণে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁরা তো হিন্দু কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। এ-কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজশেখর বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যের বিকাশে নব নব ধারার প্রবর্তন করেছেন। বিবেকানন্দ সমাজসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনে দুর্জয় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯২৯ সালে কারাগারে দীর্ঘকাল অনশনের পরে যতীন দাসের মৃত্যু হলে এ-কলেজের ছাত্ররা সুদীর্ঘ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ-উপমহাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্র রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ফজলুল হক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা আবু সয়ীদ চৌধুরী যে-ভূমিকা পালন করেছেন তাও আমাদের গর্বের বিষয়।

অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে নতুন রাজনৈতিক ভাবধারার প্রসারেও এ-কলেজের ছাত্র-অধ্যাপকরা মুখ্য ভূমিকাগ্রহণ করেছেন। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার প্রসারে ব্রতী হয়েছেন প্রেসিডেন্সির সুশোভন সরকার, হীরেন মুখোপাধ্যায়, নিখিল চক্রবর্তী ও জ্যোতি বসু। অন্যদিকে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

মানবতন্ত্রী ভাবধারা সম্প্রচারে এগিয়ে এসেছেন এ-কলেজেরই আবু শয়ীদ আইয়ুব ও অম্লান দত্ত। ষাটের দশকের শেষপাদে আবার এ-কলেজের ছাত্ররাই সাম্যবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

এ-কারণে বলা যায় প্রায় সূচনা থেকেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলেও প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বাধীন ও মৌল চিন্তার এক বিরল পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। এ-অভিযোগ ভিত্তিহীন যে প্রেসিডেন্সির ছাত্র-অধ্যাপকরা গজদন্ত মিনারের বাসিন্দা ছিলেন বা শাসকসম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহের ভূমিকা পালন করেছেন।

১৭৫তম বর্ষের ভাবনা

পঠনপাঠন ও সাহিত্যসমাজ নিয়ে ভাবনাচিন্তার যে আদর্শ বাতাবরণ পৌনে দুশো বছর ধরে প্রেসিডেন্সিতে গড়ে উঠেছে, তাকে নষ্ট হতে দেওয়া জাতির পক্ষে আত্মহননের সামিল হবে। বস্তুত আমরা বিশ্বাস করি যে বাঙালি পণ্ডিত-বিজ্ঞানীদের ভারতীয় সমাজে যে-উচ্চাসন রয়েছে তার অবনমন ঘটুক এমনটি আমরা যেমন চাইব না, তেমনি রাজ্য সরকারও চান না। তাই আশা করা যাক কলেজের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে তাঁরা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে কিছু সেরা কলেজকে অটোনোমাস কলেজ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এভাবে কলেজগুলির উৎকর্ষ সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা হয়েছে। উপরন্তু এসব কলেজ নানাভাবে মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে অতিরিক্ত অনুদান পাচ্ছে। প্রেসিডেন্সিকে মঞ্জুরী কমিশন সারাদেশের অন্যতম সেরা কলেজ বলে মনে করেন – তাঁদের মতে, এ-কলেজ শুধু অটোনোমাস কলেজ কেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল প্রতিষ্ঠান" (Deemed University) হিসেবে স্বীকৃতির যোগ্য। কিন্তু পনেরো বছর পরেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি, প্রেসিডেন্সিকে এ-মর্যাদা দান সমীচীন হবে কিনা। এমন কি কাগজ-পত্রে প্রেসিডেন্সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিট্যুয়েন্ট কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ-কলেজ কনস্টিট্যুয়েন্ট কলেজের সকল অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করেনি। এই অনিশ্চয়তা দূর করে সরকার এ-ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবেন, ১৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা এমন আশা করছি। আর শুধু পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগ নয়, কলেজের প্রতিটি বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ও গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হোক।

প্রেসিডেন্সি সরকারি কলেজ হওয়ার ফলে এখানকার শিক্ষকদের অযথা কিছু অতিরিক্ত নিয়মকানুন, বাধানিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয়। যেমন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সহজে ছুটি নিয়ে বিদেশের শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাটিয়ে আসতে পারেন, সেমিনার সিম্পোসিয়ামে অংশ নিতে পারেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সির শিক্ষকদের এজন্যে অনুমতি মেলাই ভার; অনুমতি মিললেও ছুটির শর্তাদি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়ে। মুখ্যত এসব কারণেই সাম্প্রতিককালে প্রেসিডেন্সি অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত, অমিয় বাগচী বা সুকান্ত চৌধুরির মতো শিক্ষকদের হারিয়েছে। উত্তম শিক্ষক পেতে হলে বা তাঁদের ধরে রাখতে হলে একদিকে যেমন বেতনহারের উন্নয়ন প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি সরকারি নিয়মকানুনের ফাঁস খানিকটা শিথিল করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

আরো দুটি পদক্ষেপ খুব সময়োপযোগী হবে বলে মনে হয়। প্রথমত, প্রেসিডেন্সির দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীদের আনুপাতিক সমস্যা শতকরা প্রায় ৫৫। মফঃস্বল থেকে আসা অনেক ভালো ছাত্রী স্রেফ আবাসন সমস্যার কথা ভেবে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হতে পারে না। কলেজের ১৭৫তম বর্ষে কর্তৃপক্ষ একটি ছাত্রী-আবাস নির্মাণের উদ্যোগ নিলে একটি যথার্থ প্রয়োজন মেটে। দ্বিতীয়ত, কলেজে কিছু নতুন বিভাগ চালু করার কথাও ভাবা যেতে পারে। নৃবিদ্যা ও মনোবিদ্যা বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের জন্যে আলাদা বিভাগ রাখা সমীচীন মনে হবে। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তার শিক্ষকমণ্ডলীই যে-কোনো বিদ্যায়তনকে বৈশিষ্ট্য দান করে। সুযোগ্য, স্থায়ী ও নিষ্ঠাবান শিক্ষকমণ্ডলীর অপরিহার্যতা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আর শিক্ষকদের জন্যে এক সুস্থ কর্মপরিবেশ থাকা চাই, এ-কথাটাও মনে রাখতে হবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,

> "The teacher, like the artist, the philosopher, and the man of letters, can only perform his work adequately if he feels himself to be an individual directed by an inner creative impulse, not dominated and fettered by an outside authority."[১৪]

সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রেসিডেন্সি কলেজ সারা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। সারস্বত সাধনার, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার যে ঐতিহ্য পৌনে দুশো বছর ধরে এ-কলেজটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা ও লালন করা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পবিত্র দায়িত্ব।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

উল্লেখপঞ্জী

১। অনাথনাথ বসু ঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা (পৃ.২-৩)। বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

২। অনাথনাথ বসু ঃ তদেব (পৃ.৩-৪)।

৩। *Presidency College, Calcutta : Centenary Volume 1955* (pp. 1-2). West Bengal Government Press, Calcutta, 1956.

৪। *Presidency College, Calcutta* : তদেব (pp.2-7).

৫। ভবতোষ দত্ত ঃ শিক্ষাভাবনা (পৃ. ৫৪-৫৫)। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৮।

৬। *Presidency College, Calcutta* : তদেব (pp. 9-27).

৭। ভবতোষ দত্ত ঃ তদেব (পৃ. ৫৫-৫৮)।

৮। *Presidency College, Calcutta* : তদেব (pp. 29-35).

৯। ভবতোষ দত্ত ঃ তদেব (পৃ. ৫৮-৬২)।

১০। অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা ঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অটোনমির সপক্ষে। কান্তিপ্রসাদ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৮০।

১১। A.N. Whitehead : *The Aims of Education* (p.1). Macmillan, New York, 1929.

১২। A.N. Whitehead : তদেব (p. 13).

১৩। A.N. Whitehead : তদেব (p. 93).

১৪। B. Russell : "The functions of a teacher" (included in the *Basic Writings of Bertrand Russell* (p. 442), Allen & Unwin, London, 1961).

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073